দৈনিক মাধুকর | রবিবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১৯ | ১৯ মাঘ ১৪৩১ বাংলা | ০২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪ মুল্য ৩ টাকা | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং | শেষ পৃষ্ঠা

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৫

'খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ'

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

নিরাপদ খাদ্য- সুস্থ জীবন

আজ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৫। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ'। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খাদ্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি, পুষ্টিসাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষা তথা জীবন রক্ষা করে। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরের জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আমরা জানি জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারণে দেহে নানা ধরণের প্রাণঘাতী রোগ বাসা বাঁধে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বেগবান করা জরুরি। নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যমান নিরাপদ খাদ্য আইন-এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা দরকার।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। খাদ্যশস্য ও প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও খাদ্যের পুষ্টিমান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এ পরিস্থিতিতে খাদ্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত মানসম্পন্ন খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তথ্য অনুযায়ী সবজি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সামর্থ্য ও সচেতনতার অভাবে পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশে বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্যের অন্যতম কারণ কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ। নির্বিচারে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে খাদ্য উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে ঠিকই, তবে খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে প্রাণ বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষিপণ্যের স্বাদ-গন্ধও হারিয়ে যাচ্ছে। তাই উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদিত পণ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা নিরাপদ, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে কেবল রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলেই খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে সেটাও সর্বাংশে সত্য নয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে, নানা রকম কারসাজির আশ্রয় নিচ্ছে; যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি বিশাল এবং সুশৃঙ্খল কাঠামো, কোন কারণে যদি এই কাঠামোর একটি ছোট্ট অংশেও আপোস করা হয়, তাহলে পুরো কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা এবং তাৎক্ষণিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে, এর সাথে সীমিত ও অদক্ষ জনবলও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এতবড় কর্মযজ্ঞ বিদ্যমান সীমিত জনবল দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হোটেল-রেস্তোরা পর্যবেক্ষণ শেষে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে থাকে। তবে লোকবল ও দক্ষতার অভাবে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কাজ অপর্যাপ্ত। বিভিন্ন সংশ্লিষ্টদের যে পরামর্শ দেয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অনুসারে তারা তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করে না। আশার কথা, ইতোমধ্যে খাদ্যে ভেজালকারীদের দমন করার লক্ষ্যে দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন তার কৃষি কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষির আধুনিকায়নের উপর যেমন জোর দিচ্ছে, তেমনিভাবে ফসলের নিরাপত্তা ও গুণগতমান বজায় রাখার দিকেও বিশেষ নজর রাখছে। কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন প্রচারনামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, গ্রহণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে। আমরা আশা করি বিদ্যমান সমস্যা সত্ত্বেও দেশের মানুষের স্বাস্থ্য তথা জীবন রক্ষায় আমরা সফল হব। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৫-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য প্রত্যাশা করি।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

খাদ্য নিরাপত্তায় প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি

মোঃ মিলন মিয়া

'খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপি উদযাপিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৫। খাদ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নাগরিকদের শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করলেই হবে না সেই খাদ্য হতে হবে ভেজাল ও দূষণমুক্ত। 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণিত হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩কে ভিত্তি ধরে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস ও কার্যক্রম শুরু হয় ২০২০ সালের শেষের দিকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হোটেল-রেস্তোরা, বেকারি কারখানাসহ সকল খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা ও ভেজাল সন্দেহে নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজনের পাশাপাশি শিক্ষক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়েও বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বাড়িতে খাবার পরিবেশন করে নারীরা। খাবারের নিরাপত্তা অনেকটা নির্ভর করে তাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিছন্নতার উপর। এই নারীদের খাবারের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন করে তুলতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। আবার আমাদের খাবারের এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে হোটেল-রেস্তোরাগুলো। এই হোটেল-রেস্তোরায় যারা কাজ করে তারা নিরাপদ খাবার সরবরাহের বড় স্টেকহোল্ডার হলেও নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বেশিরভাগেরই ন্যূনতম জ্ঞান নেই; যা আমাদের দেশের খাবার নিরাপদ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা দিতে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে।

পোড়াতেল আমাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম উপাদান। এই তেলে উপস্থিত ট্রান্সফ্যাট আমাদের হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। এই পোড়াতেল নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা থেকে সংগ্রহ করে ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকটা হ্রাস পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি দেশের সব বিভাগে মোবাইল ল্যাবরেটরী সরবরাহ করেছে। এই ল্যাবরেটরীগুলো প্রতিমাসে জেলাগুলোতে গিয়ে অন-স্পট খাদ্য পরীক্ষা করে। এতে করে সাথে সাথে যেমন ভেজাল বা দূষণ ধরা পড়ছে তেমনি সাধারণ মানুষজনও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারছে।

খাবার আমাদের দেহের জ্বালানি। জ্বালানি খারাপ হলে যেমন ইঞ্জিন নষ্ট হয় তেমনি খাবার নামক জ্বালানি ভেজাল বা দূষিত হলে আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিন বিকল হয়। আমাদের দেশে সবকিছুর আগে দরকার খাবার নিরাপদ রাখা। নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পেলে গড়ে উঠবে একটি মেধাবি ও কর্মক্ষম জাতি। এই জাতিই আমাদের নিয়ে যাবে আমাদের সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে।

খাবারের নিরাপত্তা রক্ষা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না। আমরা প্রত্যেকে খাবার খাই। এই খাবারের নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। মাঠ থেকে মুখ পর্যন্ত খাবার আসার এই সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তবেই নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে; অন্যাথায় নয়। নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অগ্রাধিকার আপনার, আমার, সকলের। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই আন্দোলনে আমরা হব অগ্রসেনা- এই হোক আজকে আমাদের অঙ্গীকার।

নিরাপদ খাদ্য অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, গাইবান্ধা।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস এবং আমাদের অবস্থান

কে এম রেজাউল হক

প্রতিবছরের মতো দেশে এবারও জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া বছর জুড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ খাদ্যসহ এর ব্যবস্থাপনা, পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, ভেজাল প্রতিরোধ বিষয়ে প্রায় ২১টির মতো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে; যা স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে নিবিড় পর্যালোচনায় আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

'খাদ্য নিরাপত্তা' বলতে বোঝায় সেই শর্ত এবং এর সংশ্লিষ্ট অনুশীলনগুলো যা দূষণ এবং খাদ্যজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধে খাদ্যের গুণমান রক্ষা করে। খাদ্য নিরাপত্তা পুরো খাদ্য শৃংখলের মাধ্যমে গুণগত মান ও নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত করে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি নির্ভর এবং বেশিরভাগ খাদ্য পণ্যের উৎস কৃষি। কাজেই আমাদের জৈব কৃষির বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। জৈব কৃষির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত না করে স্থায়ী উৎপাদন করা। মূলত জৈব কৃষিতে প্রাণী, উদ্ভিদ, পরিবেশ এবং মানবস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এইভাবেই স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না এমন কৃষিকাজ পরিচালনা করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। একটি খাদ্য পণ্য উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার কাছে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে দূষিত হতে পারে। কাজেই খাদ্য পণ্যের এই প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি যাতে বিজ্ঞানসম্মত এবং সঠিক মানসম্পন্ন হয় সে দিকগুলোর প্রতি সতর্কতাও অপরিহার্য।

আবার ৭ জুন বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস যথারীতি পালন করা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশই এই দিবস পালন করে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঝুঁকি নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

সুস্থ' ও সবল জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। কাজেই নির্ভেজাল পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের উৎস থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের উপরেই নির্ভর করে নিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন। আমাদের দেশে এই পদ্ধতিগত ত্রুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক। নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে ২০১৩ সালে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে কার্যকর করা হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এই আইনের অধীনে একটি জাতীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা মূলত একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যন্ত খাদ্য শৃংখলের প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্য ও শিল্প ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে সঙ্গে নিয়ে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধান তৈরি করা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শৃংখল পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে এমন অভ্যাস এবং শর্তগুলো বোঝায়, যা প্রস্তুত, পরিচালনা এবং সংরক্ষণের সময় দূষণ এবং খাদ্যজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করতে খাদ্যের গুণমান রক্ষা করে।

খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি আমাদের দেশে সর্বজনবিদিত সমস্যা। এর থেকে বের হওয়া খুব কঠিন। বাজারে কোন পণ্যই সঠিক মানের নাই। দুধ, ঘি, সরিষার তেল, হলুদ এ ধরনের পণ্যে ভেজাল প্রবণতা দীর্ঘকালের। বাজারে এসব পণ্য এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর এরকম মানের পাওয়া যায়। মূল কথা হচ্ছে আসল পণ্যের গুণমান বেশি এবং ভেজাল পণ্য অনেক কম দামে পাওয়া যায় বিধায় ভোক্তারা এসব পণ নিয়ে আসক্ত হয়। হোটেল বা রেস্তোরায় দেখা গেছে, বাসি বা পুরনো খাদ্য সামগ্রী কখনো ফেলে দেয়া হয় না। এগুলো বিভিন্নভাবে উপাদান হিসেবে অথবা অন্য পণ্যে রূপান্তর করার মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে সরবরাহ করা হয়।

এটি লক্ষণীয় যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ ধরনের বাঁশি-পঁচা খাদ্য ড্রেনে ফেলে দেয়ার ছবি আমরা পত্রপত্রিকায় দেখে থাকি। পারতপক্ষে কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্টের মালিকপক্ষ কখনোই বাসি বা পঁচা খাদ্য সামগ্রী ডাস্টবিনে ফেলে না। কার্যত অসৎ ব্যবসায়ীরা অতিমাত্রায় লোভ এবং ভোক্তা সাধারণকে প্রতারণা করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ধনী হওয়ার প্রবণতা খাদ্যে ভেজাল দেয়ার মূল কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে অসৎ ব্যবসায়ীর আধিক্য লক্ষণীয়। এদের অপতৎপরতায় সৎ ব্যবসায়ীরা বলতে গেলে প্রায় কোণঠাসা। তাদের পক্ষে সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অসৎ ব্যবসায়ীদের লাভের অংক এত বেশি যে সৎ ব্যবসায়ীরা এর ধারে কাছেও আসতে পারছে না। ফলে এসব উচ্চাভিলাষী অসৎ ব্যবসায়ীরা দ্রুত অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন রাসায়নিক ও অর্থনৈতিক দূষণ দ্বারা দূষিত হচ্ছে। আর এই খাদ্য দূষণের মূল কারণ মাঠ পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন এবং শিল্প কারখানায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে জড়িতদের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। শুধু উৎপাদক বা প্রক্রিয়াজাতকারী নয়, ভোক্তাদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ পদ্ধতিতে খাদ্যপণ্য রান্না, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং অসচেতনতার কারণে খাদ্যসামগ্রী অনিরাপদ হয়ে যেতে পারে।

চরাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তায় প্রয়োজন বাড়তি ব্যবস্থা গ্রহণ

ডা. আরমিনা খাতুন

বাংলাদেশে প্রতিবছর ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের প্রতীক। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষকরে প্রত্যন্ত ও দুর্গম চরাঞ্চলে নিরাপদ খাদ্য এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা এখনও মূল ধারায় স্বীকৃত হতে পারেনি।

গাইবান্ধা জেলা, যা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত, ছোট-বড় সব মিলিয়ে জেলাটিতে প্রায় ১৬০টি চর আছে। জেলাটির বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। বন্যা, নদী-ভাঙন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী।

"নিজের চোখের সামনে আমগোর বাগান, বাড়ি নদীত যাবা দেখিয়া মোর আর মোর স্বামীর হুশ আছিল না; হামরা পাগল হই গেছিলাম। হামরার লাগানি নারিকেল গাছগুলাত পত্থমবার নারিকেল ধরছিলো, একটাও তখনো পাড়া হয় নাই। সেই গাছ নদীত যাবার দেখিয়া কি ঠিক থাকা যায়? এরপর মেলা দিন হামার মাথার ঠিক আছিলো না" - শুনছিলাম একজন চরে বসবাসকারী নারীর করুন আর্তনাদ। যেখানে নিরন্তর চলছে ভাঙা আর গড়ার খেলা। প্রকৃতির এই ভাঙা-গড়ার খেলায় জীবন যেখানে বিপন্ন, নিরাপদ খাদ্য সেখানে বিলাসিতা।

চরের মানুষের প্রধান খাদ্য হলো ভাত, ডাল, সবজি এবং মাছ। তবে এই খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে। কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার, মাছ ধরা ও সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত সুবিধা, এবং দূষিত পানি ব্যবহারের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। এছাড়া, চরের মানুষের কাছে নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে, তারা প্রায়ই নিম্নমানের বা দূষিত খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

তবে সবচেয়ে বেশি খাদ্য ঝুঁকিতে আছে চরের কিশোরী গর্ভবতীরা। চরের কিশোরীরা এমনিতেই অপুষ্টিতে ভোগে। এর মধ্যেই সেই অপুষ্ট শরীরে যখন একটি নতুন প্রাণ জানান দেয়, তখন সেই বাড়ন্ত প্রাণের জন্য নিরাপদ ও পরিমিত খাদ্যের জোগান দেয়া আরো বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। অপুষ্টিতে ভোগা এই মা বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য জটিলতায় ভুগছে, এমনকি মা ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও এসব চরে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। অপুষ্টিতে ভোগা এই নবজাতকরা জন্মের পর বিভিন্ন জটিলতায় ভুগতে থাকে এবং তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই একটা বড় সংখ্যক শিশুকে আমরা হারিয়ে ফেলি। যদি কোন পরিসংখ্যান করা হয়, তবে এমন মা পাওয়া হয়তো কঠিন হয়ে যাবে, যার অন্তত একটি শিশুমৃত্যুর ইতিহাস নেই।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা শুধুমাত্র একটি দিবস পালনের বিষয় নয়; বরং এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন। বিশেষ করে, চরের মতো দুর্গম এলাকায় টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য কর্মী।

কৃষির আধুনিকায়ন বনাম নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন

মোঃ জামাল উদ্দিন

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের মানুষের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষিজ পণ্য। তাই অর্থনীতিকে উন্নততর করার জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর দিকে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রচেষ্টার ফলও বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা ভোগ করছে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি। এর পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে যথেচ্ছ পরিমাণে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক। এর ফলে একক পরিমাণ জমিতে ফলন বেড়েছে বহুগুণ। এই ফলন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি গবেষক, সাধারণ কৃষক থেকে শুরু করে বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদকারী কৃষক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এ জন্য আমরা দেখতে পাই যে, স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে যদিও কৃষি জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, কিন্তু ফলন বেড়েছে বহুগুনে। তাই বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটাই কি মূল কথা? প্রশ্নটা হচ্ছে এখানেই। মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য কতটুকু আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি সেটা কি ভেবে দেখার কথা না? হ্যাঁ, অবশ্যই এখন সময় এসেছে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে ভাবার, কথা বলার এবং এটা নিয়ে কাজ করার।

আসুন আগে আমরা নিরাপদ খাদ্য বলতে কি বুঝি সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেই। "নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাবারকে বোঝায় যাতে কোন বিষাক্ত, ক্ষতিকর বা রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থ বা অনুজীব না থাকে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।" সাধারনভাবে নিরাপদ খাদ্যের ধারণা আমরা এভাবেই নিতে পারি। এবার নিরাপদ খাদ্য কিভাবে অ-নিরাপদ হয় সে সম্পর্কে ধারনা নেয়া যাক। খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি ধাপেই কোন না কোনভাবে খাদ্য মানুষের জন্য অনিরাপদ হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে ফলন বৃদ্ধির জন্য বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন রাসায়নিক বালাই নাশক যেমন-কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, কৃমিনাশক ইত্যাদি। বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বালাইনাশক এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষক্রিয়া তৈরি হচ্ছে ফসলে এবং মাটিতে। এ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়ার মাত্রা বহুদিন পর্যন্ত ফসলে ও মাটিতে বিদ্যমান থাকে। যার ফলে একদিকে মানুষের জন্য অনিরাপদ খাদ্য তৈরি হচ্ছে আবার অপর দিকে বিভিন্ন উপকারী ও ক্ষতিকর জীব মারা গিয়ে পরিবেশের ইকো সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অ-নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের দেহে তৈরি হচ্ছে ক্যান্সারসহ আরো অনেক জটিল ও দূরারোগ্য ব্যাধি। ফলশ্রুতিতে মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, বিকলাঙ্গ ও অকাল মৃত্যুতে পতিত হচ্ছে; হারাচ্ছে মানুষের কর্মক্ষমতা। এর ফলে দূষিত হচ্ছে পানি ও পরিবেশ। মৎস সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশের জন্য উপকারী কীটপতঙ্গ ও অনুজীব। প্রাকৃতিক লাঙ্গল নামে পরিচিত কেঁচোর পরিমাণ অসম্ভব পরিমাণে ফসলী জমিতে কমে গেছে যারা মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। লেডিবার্ড বিটল, ক্যারিবিট বিটল, ইয়ারউইগসহ নানা প্রজাতির উপকারী পোকার পরিমাণ কমে গেছে; যারা ফসলের ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফসল রক্ষা করতো। অপরদিকে ফসল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ও যুক্ত হচ্ছে নানা রকমের রাসায়নিক বিষ যাদের রেসিডুয়াল ইফেক্ট হয় দীর্ঘদিনের। ফলে মানুষ অ-নিরাপদ খাদ্যের কবলে পড়ছে সব দিক দিয়ে। এ ছাড়াও এ সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ছে ফলে ফসল থেকে অনেক সময় খুব একটা লাভও পাচ্ছেন না কৃষকেরা।

পরিত্রাণের উপায় কি? যদিও আধুনিক কৃষি উৎপাদনের মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা করা, তারপরও কৃষিতে আমাদের রাসায়নিকের অব্যবস্থাপনা ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার যেকোন মূল্যে শৃংখলার মধ্যে রাখতে হবে। ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ও যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার দিকে এখনই মনোযোগ দিতে হবে। জৈবিক চাষাবাদ পদ্ধতির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে আধুনিক ও উন্নত জাতের এবং বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদের দিকে। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ এর দিকে বিষেশভাবে নজর দিতে হবে। স্থায়ীত্বশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও এর সম্প্রসারণ করতে হবে। এর পাশাপাশি কৃষকদের জলবায়ু সহনশীল ফসলের চাষাবাদ, আধুনিক কৃষি উৎপাদন, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। বাজার ব্যবস্থপনাকে আধুনিক করতে হবে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে হবে। তবেই আশা করা যায় বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার মুখে নিরাপদ খাদ্য তুলে দেওয়া যাবে।

বিটরুট চাষে মাহফুজার মুখে হাসি

প্রদীপ রায়

গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের মোছাঃ মাহফুজা বেগম। তিনি একজন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির লাগোয়া ২০ শতক জমিতে ধান ও সবজি চাষ করেন। তেমন লাভবান হতে পারছিলেন না। গত নভেম্বর মাসে তিনি সবজি চাষের জন্য আবার জমি প্রস্তুত করেন। কিন্তু থমকে যান খরচের চিন্তায়। প্রতিবেশীর পরামর্শে দেখা করেন এসকেএস ফাউন্ডেশনের "Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project" (SMAP) প্রকল্পের কর্মকর্তার সাথে। প্রস্তাব পান দামে ভালো, পুষ্টিতেও সেরা বিটরুট চাষের। প্রথমে দ্বিধান্বিত থাকলেও বিটরুট চাষে রাজি হয়ে যান মাহফুজা। এসকেএস- এর ২০,০০০ টাকা সহায়তায় শুরু করেন বিটরুট আবাদ।

ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি ছেড়ে বিটরুট চাষে প্রতিবেশীর তেমন সায় ছিল না। এসকেএস- এর প্রকল্প কর্মকর্তার পরামর্শে পরিচর্যা চলে নিয়মিত। ফলাফল, তিনমাসে মাহফুজার বিটরুট ক্ষেত লাখ টাকার সম্পদে পরিণত হয়েছে। নিজের ২০ শতক জমিতে বিটরুট চাষে খরচ করেছেন ২০ হাজার টাকা। এখন জমিতে প্রায় এক হাজার কেজি বিটরুট দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বাজার দর ১৫০ টাকা কেজি হিসেবে তার মোট বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ১৫০,০০০ টাকা। মাহফুজা আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, কমপক্ষে ১ লাখ টাকা লাভ করবেন তিনি। তার এই সাফল্য স্থানীয় জনগণ ও গণমাধ্যমের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মাহফুজার সাথে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেল, তিনি একজন উদ্যোগী কৃষক। আবার শুধু আর্থিকভাবে লাভই সব নয়, বিটরুট চাষকে তিনি নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করছেন। প্রকল্প কর্মকর্তার কাছে থেকে জেনেছি, "বিটরুট একটি পুষ্টিকর সবজি, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগ প্রতিরোধ এবং শরীরের অন্যান্য উপকারিতায় ভূমিকা রাখে। এটা মাথায় রেখেই তিনি বিটরুট চাষে আগ্রহী হন," বললেন মাহফুজা বেগম।

মাহফুজা বেগম আরও জানান, "প্রকল্প কর্মকর্তারা আরও উল্লেখ করেন যে, প্রচলিত সবজি চাষে বাজার দর কমে যাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন; কিন্তু বিটরুট চাষে এই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। কারণ বিটরুট সবজির পাশাপাশি ফল এবং দানাদার খাবার হিসেবেও সংরক্ষণ করা যায়; যার বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।"

মাহফুজা বেগমের এই সাফল্য তার প্রতিবেশীর মধ্যে অর্থকরী ও পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মাহফুজার মতে, "আমি শুধু একটি সবজি উৎপাদন করছি না, বরং মানুষকে নিরাপদ খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ওষুধ দিচ্ছি। এসকেএস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আমি আধুনিক এই সফল কৃষি প্রযুক্তি ও বিষমুক্ত চাষাবাদ সম্পর্কে ধারনা পেয়ে লাভবান হয়েছি।"

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com